অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। আম-জনতার নির্বাচন ।।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনে কী না করেছেন। তেমনি একবার তাঁর ইচ্ছে হলো তিনি নির্বাচন করবেন। ওই বিদ্রোহীকে তো সবাই জানেন। যা ভাববে তা করেই ছাড়বে। তো সেবার স্থানীয় এক নির্বাচনে সকলের নিষেধ উপেক্ষা করে কবি নির্বাচনে দাঁড়ালেন। তাঁর ধারণা সবাই তাঁর গান কবিতা এতো ভালবাসে এবং তিনি সর্বত্র এতই পরিচিত, অতএব জয় তাঁর সুনিশ্চিত। তো ভোটের দিন গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে ভোট কেন্দ্রের সামনে নিজেই গান ধরলেন। সঙ্গে দুই প্রিয় বন্ধু কমরেড মোজাফ্ফর আহমেদ আর পল্লীকবি জসিম উদ্দীন। তাঁর গানের সাথে তাঁরাও তাল দিচ্ছেন। ভোটাররা একে একে ভোট দিয়ে যায় আর যাবার সময় কবি নজরুলের পিঠে হাত বুলিয়ে যায়। এতে করে কবি-র আরো উৎসাহ বেড়ে যায়। ভাবছেন তাঁর বিজয় এবার ঠেকায় কে। ভোট শেষে যখন গণনা শুরু হলো দেখা গেল কবির পক্ষে সর্বসাকুল্যে ভোট পড়েছে তিনটি। একটি তাঁর নিজের আর বাকী দু'টি কমরেড মোজাফ্ফর আহমেদ আর কবি জসিম উদ্দীনের।

সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশের তিন সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের খবরাখবর দেখে-শুনে মনে হচ্ছে তেমনি এক নির্বাচন হলো যেন। গোলাম মওলা রনি আর মাহী বি চৌধুরীসহ অনেকের জামানত বাজেয়াপ্ত। আবার কেউ কেউ জামানত বজায় রাখতে পারলেও ভানু বন্দোপাধ্যায়ের উক্তির মত "যুদ্ধেই যামু না" বলে নির্বাচন বর্জন করলেন। আমার কষ্ট হচ্ছে বেচারা তাবিথ আউয়াল আর মঞ্জুর আলমের কথা মনে করে। এ দু'জন রাজনীতির খেলায় হলেন বলির পাঁঠা। আব্দুল আওয়াল মিন্টুর নাম কম বেশী দেশের মানুষ শুনেছেন কিন্তু তাবিথের নাম ওঁর পরিবারের বাইরে কেউ কী খুব একটা জানতো? তিনি কোন দলের রাজনীতি করেন বা সমর্থন করেন তাও কী কেউ জানতো? অথচ বিএনপির এতো যোগ্য এবং ত্যাগী নেতা-কর্মী থাকতেও অখ্যাত এক তাবিথকে বিএনপি সমর্থন দিলো। বর্জনের চিন্তা মাথায় রেখেই তাকে সমর্থন দেয়া যাতে তাবিথের খরচেই ভোট বর্জনের মধ্যে দিয়ে একটি রাজনৈতিক অর্জন (?) হতে পারে। সাংবাদিক সম্মেলনে টিভির পর্দায় বেচারা তাবিথের কান্না কান্না মুখটা দেখে মনে হচ্ছিলো তিনি বোধকরি স্বপ্নেও ভাবেননি তিনি এমন একটি রাজনৈতিক খেলার শিকার হবেন। তাবিথের সেই কান্নাভেজা মুখ দেখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই গানটির কথাও মনে পড়ছিলো - " না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখি জলে... ...।"

একই দশা মঞ্জুর আলমেরও। বিএনপির সমর্থন পেয়েছিলেন ঢাকা থেকে কিন্তু চট্টগ্রামে তাঁর প্রতি দলীয় কোন সমর্থন মাঠ পর্যায়ে ছিলো না। বস্তুত তিনি আওয়ামী ঘরানা পরিবারের মানুষ। রাজনীতির খেলায় যদিও গতবার তিনি কেন্দ্রীয় বিএনপির সমর্থনে মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু এবারে স্থানীয় বিএনপি তাঁকে লোক দেখানো সমর্থন দিয়েছিলো কেবল। কেন তা করবে না। চট্টগ্রামে অনেক হেভিওয়েট নেতা ছিলেন যাঁরা মঞ্জুরের চেয়ে দলে অনেক প্রভাবশালী এবং প্রিয় মুখ, অথচ তাদের বাদ দিয়ে মঞ্জুরকে সমর্থন দেয়া হলো কেবল পূর্বপরিকল্পিত নির্বাচন বর্জনের কারণে। মঞ্জুর, তাবিথ নির্বাচন না করতে পারলে বিএনপির কিছু যায় আসে না এবং তাঁরা দলের জন্য এমন কোন ফ্যাক্টরও নন। তাই বলির পাঁঠা তাঁদেরকেই বানানো হলো। মঞ্জুর যখন দেখলেন ভোট কেন্দ্রে তাঁর কোন লোক নেই, পোলিং এজেন্ট নেই এবং যখন স্পষ্ট হলো তিনি বলির পাঁঠা তখনই নির্বাচন বর্জনের প্রস্তাব আসাতে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। সংবাদ সম্মেলনে ক্ষোভের চোটে বলেও দিলেন এই সাথে তিনি রাজনীতি থেকে অবসরও নিয়ে নিচ্ছেন। সংবাদ সম্মেলনে তাঁর সে

বক্তব্য শুনতে শুনতে মান্না দে'র সে গানটা মনে হলো - তুমি আর ডেকো না পিছু ডেকো না আমি চলে যাই শুধু বলে যাই ... ...।

মির্জা আব্বাস বিএনপির নিজস্ব লোক- বলির পাঁঠা নন। তাঁকেও নির্বাচন করতে দেয়া হলো না বর্জনের নামে্। অবশ্য তিনি সুবিধা করতে পারছিলেন না সাদেক হোসেন খোকার দলবলের কারণে। যেদিন থেকে মহানগর বিএনপির দায়িত্ব সাদেক হোসেন খোকাকে না দিয়ে মির্জা আব্বাসকে দেয়া হলো সেদিন থেকেই মহানগর বিএনপি দুই ভাগ। এই দুই ভাগের কারণেই গত জানুয়ারী থেকে তিন মাসে বাস আর মানুষ পোড়ানো আন্দোলনে মহানগরে কোন সফল আন্দোলন দানা বাঁধতে পারেনি। আর এটা সবাই জানে যে ঢাকায় আন্দোলন দাঁড় করাতে না পারলে সে আন্দোলন সফল করানো কঠিন।

বিভক্ত দলের নেতিবাচক ভূমিকা যে কেবল বিএনপিতে ছিলো তা কিন্তু নয়। হাজী সেলিমকে ধমকিয়ে বসিয়ে দেয়া হয়েছে ফলে তার দলও চুপচাপ বসে থাকেনি। কাউন্সিলরদের নির্বাচন ক্ষেত্রে বিভক্ত দলের ভোটকেন্দ্রে মারামারি, ব্যালট ছিনতাই, বল প্রয়োগে ব্যালটবাক্স ভর্ত্তি হয়েছে। আর সরকার সেগুলোকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমে প্রশ্রয় দিয়েছে। যা তাদের করার কোন প্রয়োজনই ছিলো না। সেগুলো ছাড়া তাদের প্রার্থীরা অনায়াসেই জিততে পারতো। বিএনপি অনেক আগেই টের পেয়েছে জামায়াত আর তাদের সাথে আগের মত নেই। লোক দেখানো কিছু কর্মকান্ডে একসাথে আছে। থাকবেই বা কেন। একে একে জামায়াতের নেতার ফাঁসি হচ্ছে সেখানে বিএনপি টুঁ শব্দটিও করছে না ফলে বিএনপি প্রার্থীকে জিতিয়ে জামায়াতের কোন ফায়দা উঠবে না। কার্যতঃ ভোটের মাঠে বিএনপির না ছিলো নিজের লোক না ছিলো পুরোনো বন্ধু জামায়াত। প্রশ্ন তবে বিএনপি কেন নির্বাচনে এলো?

এলো দ্বিতীয় পায়ে দ্বিতীয় কুড়ালটি মারতে। মানুষ পোড়ানো আন্দোলনে অসফলতা তাদের প্রথম কুঠারাঘাত আর নির্বাচনে নেমে পরে বর্জন করা তাদের দ্বিতীয় কুঠারাঘাত। তারা ভেবেছিলো দেশে বিদেশে দেখাতে পারবে যে তারা নির্বাচন করার দল যেটা তারা ৫ জানুয়ারীতেও করতে চেয়ে ছিলো কিন্তু সরকারের শঠতা এবং অগনতান্ত্রিক কর্মকান্ডের কারণে তারা নির্বাচন করতে পারছে না আর করলেও তাদেরকে কোনঠাসা করে রেখে বিজয়ী হতে দিচ্ছে না। অতএব এ সরকারের অধীনে কোন নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে না। কিন্তু নির্বাচনের আগে বিএনপির নেতা-কর্মীদের টেলিফোন কথপোকথন যা সংবাদ মাধ্যমে বারবার দেখানো এবং শোনানো হলো তাতে স্পষ্ট যে নির্বাচন বর্জন তাদের পূর্বপরিকল্পিত।

প্রশ্ন হলো বর্জন করে তারা কী কিছু অর্জন করতে পেরেছে? কোন মানুষ এমন কী তাদের নিজেদের নেতা-কর্মীরাও এ ভোট বর্জন মেনে নিতে পারেননি। তাদের কথা ম্যাডাম কী দেখেননি এর আগে যখন চট্টগ্রামে সিটি করপোরেশনের নির্বাচন হয়েছিলো তখন নেতা কর্মীরা সারারাত রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় ঘেরাও করে রেখেছিলো যাতে তাদের কাঙ্খিত ফল পরিবর্তন করতে না পারে। এবং সরকার তা পারেও নি। কারণ কর্মীরা জানতো সবাই তাদের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে। জয় তাদের হবেই এবং শেষ পর্যন্ত হয়েও ছিলো। তাহলে এবার কেন শেষ না করে উল্টো বর্জন করলো? বর্জন না হলে শেষ মুহুর্তে হয়তো আব্বাসই জিতে যেতেন কারণ তূলনা মূলকভাবে ভোটের ভাগ তাঁরও কম নয়। সেটি হলে অন্তত এ কথাটি বলা যেতো যে সরকার যতই বলুক বিএনপি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আদতে তা হয়নি নইলে এতো গুলো ভোট পেলো কী করে?

সরকারের পক্ষ থেকে এই সিটি করপোরেশনের ভোটে হার জিত নিয়ে এতো বাড়াবাড়ি করার কোন প্রয়োজন ছিলো না। তিন জায়গাতে হারলেও সরকারের কিছু ক্ষতি ছিলো না। এর আগেও তো এই

সরকারই সিটি করপোরেশনের নির্বাচন করিয়েছিলো যেখানে সরকারের ভরাডুবি হয়েছিলো তারপরেও কী সরকার পড়ে গিয়েছিলো? এবারে সেই আগের বারের মত শক্ত হলে বরং সরকারের ইমেজ আরো বাড়তো। আর সরকারের ইমেজ বেড়ে যাওয়া মানেই মানুষের আরো সান্নিধ্যে সরকারের চলে আসা - আর বিরোধীদের ক্রমশঃ দূরে সরে যাওয়া। বিজয় হতো সরকারেরই।

তাই হলপ করে বলতে পারি জয় কারোরই হয়নি - না সরকারের না বিএনপির। মানুষ পোড়ানো আন্দোলন করতে গিয়ে বিএনপি যতখানি পিছিয়ে ছিলো এবার আরো বেশী পিছিয়ে গেলো। সে জন্যেই এখন মিডিয়ায় দেখি বিএনপি বলছে সহসাই আর আন্দোলন নয় এবার আগে ঘর গোছাতে হবে। তাই-ই গোছাতে হবে তাদের। কারণ বিএনপির কেউ আর ঘর মুখো হচ্ছে না। ময়দানে এখন সেই অধ্যাপক ইমাজউদ্দীনই সম্বল যিনি হয়তো আগামীতে বঙ্গভবনে ইয়েসউদ্দীনের মত খুঁটি গাঁড়ার স্বপ্নে বিভোর। সরকার যদি কঠোর ব্যবস্থায় নর্মালভাবে নির্বাচনটা হতে দিতো তাহলে তিনটিতে না হলেও দুটিতে অবশ্যই জয়ী হতো কিন্তু সরকারের জয়টা হতো বিশ্বজয়ের। সারা বিশ্বকে দেখাতে পারতো আমরা এভাবেই নিরপেক্ষ নির্বাচন করি এবং আগামীতেও আমরা এরূপ নির্বাচন করবো যেখানে কোন তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজন নেই।

যাহোক সরকার আমাদের চেয়ে অনেক ভাল জানে ভালো বোঝে। তারা ভাল বুঝলে ভাল - তাদের ভাল। কিন্তু খারাপ বুঝলে তাদের আগে আমাদের সর্বনাশ। সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে যাঁরা জয়ী হয়েছেন তাঁদের জানাই অভিনন্দন। আশা করি আপনারা আপনাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি গুলো রক্ষা করবেন। যে প্রতিশ্রুতি আপনারা বিভিন্ন বক্তৃতায় আপনাদের প্রিয় ভাই বোন এবং কমলীর মাকে দিয়েছেন।

পাঠক - কমলীর মা কথাটা বলে বোধহয় একটা ধান্দা লাগিয়ে দিলাম। বেশ, যাবার আগে তবে ধান্দাটা কাটিয়ে দেই। - এক ভারতীয় অবাঙালী তাঁর নির্বাচনী সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করবার সময় বলছে - পেয়ারে ভাইয়োঁ আওর ব্যাহেনো। এ টুকু বলতেই দেখে সামনে তো তার বউ বসে আছে। তাকে তো কিছু বলা হলো না, বাড়ী গেলে তো খবর আছে। একটু সামলে নিয়ে সে আবার বললো পেয়ারে ভাইয়োঁ আওর ব্যাহেনোঁ, আওর কমলী কা মা (তার মেয়ের নাম কমলী)। কমলীর মা বুঝলো তাকেও সম্বোধন করেছে, আর আম জনতা ভাবলো বোধহয় কোন দোয়াদুরুজ পড়েছে। একদম আমাদের আম জনতার মত। নইলে কি আর এরশাদ এখনো রাজনীতি করতে পারে? এতো মানুষ পোড়ানোর পরও মানুষ আবার ভোট দেয়! সবই ভুলে যায়।